৫. স্বদেশি আন্দোলন (Swadeshi Movement)

স্বদেশি আন্দোলনের গুরুত্ব : গুরুত্ব বা ইতিবাচক প্রভাবের দিক থেকে বিবেচনা করলে দেখা যাবে নানাভাবেই সমাজে, জনজীবনে ও রাজনীতিতে স্বদেশি আন্দোলনের প্রতিফলন লক্ষ করা গেছে :

প্রথমত, প্রকৃতি ও পদ্ধতির দিক থেকে নরমপন্থী, চরমপন্থী এবং সন্ত্রাসবাদী সব মহলেই এই আন্দোলন সাড়া ফেলেছে। নরমপন্থীদের কাছে এই আন্দোলন ছিল সাময়িক ও রাজনৈতিক হাতিয়ার মাত্র। বঙ্গভঙ্গ যে মানুষের মনে বিশেষত ছাত্র সমাজের উপর গভীর রেখাপাত করেছে একথা ভেবে তারা এই আন্দোলনের পক্ষে অগ্রসর হয়েছে। সুরেন্দ্রনাথের মনে হয়েছে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী বিতর্ক থেকেই স্বদেশির ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছে। দেশের শিল্পকে কীভাবে সংরক্ষণ করা যাবে এ প্রশ্ন উঠে এল। তবে স্বদেশি বলতে শুধু বিদেশি দ্রব্য বর্জন নয়, স্বদেশি শিল্পোদ্যোগকে যেমন বোঝানো হয়েছিল, তেমনি সমবায়, যৌথ খামার, গঠনমূলক কাজ, আত্মশিক্ষা এবং ভ্রাতৃত্ব বন্ধনের কর্মযজ্ঞকেও বোঝানো হয়েছিল। চরমপন্থীদের কাছে স্বদেশি ছিল স্বরাজ লাভের প্রস্তুতি। স্বদেশির কর্মযজ্ঞে বয়কট ও জাতীয় শিক্ষার আয়োজন আলাদা মাত্রা লাভ করেছিল। স্বদেশি আন্দোলনের পক্ষে জনমত সংগঠনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছে বরিশালের *'স্বদেশ বান্ধব'*, ঢাকার *'অনুশীলন সমিতি'* এবং সে যুগের বিখ্যাত সংবাদপত্র *'বেঙ্গলি', 'সঞ্জীবনী'* প্রভৃতি। টাউন হলের সমাবেশ, কার্লাইল সার্কুলারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ, সাধারণ ধর্মঘট সব কিছুই জনজাগরণের উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত। জাগরণে, প্রতিবাদে মুসলমান সমাজও অংশ নিয়েছে লিয়াকৎ হোসেন, আবদুল রসুল, সৈয়দ আমীর হোসেন, গজনভী, সামসুল হুদা প্রমুখের নেতৃত্বে। বয়কট ও জাতীয় শিক্ষার বিস্তারের সপক্ষে এঁরা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছেন। সভা, সমিতি, গোপন সমিতি, বিপ্লবী গোষ্ঠী, সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ—সব কিছু মিলে গণ-আন্দোলন ক্রমশ নতুন পর্বের সূচনা করেছে। পন্থা ভিন্ন হলেও কে না ছিলেন এই আন্দোলনে। সুরেন্দ্রনাথ থেকে রবীন্দ্রনাথ, অরবিন্দ, বারীন্দ্র, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, সখারাম গণেশ দেউস্কর, ক্ষুদিরাম, প্রফুল্ল চাকি, উল্লাস দত্ত, বাঘা যতীন প্রমুখের উপস্থিতিতে ও নেতৃত্বে জেগে উঠেছে এই আন্দোলন।

দ্বিতীয়ত, বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের মূল প্রভাব পড়েছে সমকালীন বাংলা সাহিত্যে। রবীন্দ্রনাথ, রজনীকান্ত, কালিপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ, বিপিনচন্দ্র পাল, স্বর্ণকুমারী দেবী, প্রমথনাথ দত্ত, অমৃতলাল বসু, গিরিশচন্দ্র, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, মুকুন্দদাস, সংগীত, গল্প, নাটক, প্রবন্ধ—সাহিত্যের নানা এলাকায় নিজেদের

প্রতিভা বিকাশের সুযোগ পেয়েছেন এবং সমাজের মনকে জাগ্রত করেছেন। বেশ কিছু গান স্বদেশি আন্দোলনের পটভূমিতে সৃষ্ট যা আমাদের স্মৃতিপটে অক্ষয় হয়ে আছে:

* আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি (রবীন্দ্রনাথ)
* এবার তোর মরা গাঙে বান ডেকেছে, জয় মা বলে ভাসা তরী (রবীন্দ্রনাথ)
* আজি বাংলাদেশের হৃদয় হতে (রবীন্দ্রনাথ)
* ওদের বাঁধন যতই শক্ত হবে ততই বাঁধন টুটবে (রবীন্দ্রনাথ)
* ও আমার দেশের মাটি, তোমার পরে ঠেকাই মাথা (রবীন্দ্রনাথ)
* আমি ভয় করব না ভয় করব না (রবীন্দ্রনাথ)
* আজি কি শুভদিন আইল (গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী)
* ছেড়ে দাও কাচের চুড়ি বঙ্গনারী (মুকুন্দদাস)
* মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নে রে ভাই (রজনীকান্ত সেন)
* মাগো! যায় যেন জীবন চলে
  শুধু জগৎ মাঝে তোমার কাজে,
  'বন্দেমাতরম্' বলে' (কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ)
* আর সহে না, সহে না, জননী, এ যাতনা আর সহে না (বিপিনচন্দ্র পাল)
* আমরা যা করছি তা করবই করব (প্রমথনাথ দত্ত)
* ওরে ক্ষ্যাপা, যদি প্রাণ দিতে চাস্, এই বেলা তুই দিয়ে দেনা (যতীন্দ্রমোহন বাগ্‌চি)
* বাঙালি বড় বুদ্ধিমান কে বলে সংসারে।
  এমন বোকা কোথাও না দেখি যে কাহারে।। (অশ্বিনীকুমার দত্ত)

নাটক '*বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ*' (অমরেন্দ্র দত্ত), গল্প '*রাখিবন্ধন*', (যোগেশচন্দ্র মজুমদার), '*পূজার চিঠি*' (যশোমালিনী দেবী), '*পরাজয়*' (আশালতা সেন), 'ব্রতধারণ' (সুরবালা দাসী), '*খালাস*', '*উকিলের বুদ্ধি*' (প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়), উপন্যাস '*ঘরে বাইরে*' (রবীন্দ্রনাথ), প্রবন্ধ '*বঙ্গবিভাগ*', '*অবস্থা ও ব্যবস্থা*', '*বিজয়া সম্মিলন*' (রবীন্দ্রনাথ), '*বয়কট ও স্বদেশীয়তা*' (প্রমথনাথ চৌধুরী), '*স্বদেশি তত্ত্ব*' (চাবুকরাস চৌবে), '*স্বদেশি আন্দোলন ও পলিটিক্স*' (ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়), '*বন্দেমাতরম্*' (নগেন্দ্রকুমার গুপ্ত), '*বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা*' (রাজেন্দ্রকুমার ত্রিবেদী), '*সোনার বাংলা জাগিবে কি?*' (নিখিলনাথ রায়)—বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন ও স্বদেশি আন্দোলনের উজ্জ্বল দলিল হিসাবে স্বীকৃত।[১২]

তৃতীয়ত, স্বদেশি আন্দোলন উদ্দেশ্য, ব্যাপকতা, স্বতঃস্ফূর্ততা সব কিছুর ক্ষেত্রেই ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। এই আন্দোলনের বড়ো সাফল্য কার্জন যাকে 'Settled Fact' বলে ঘোষণা করেছেন শেষপর্যন্ত তা 'Unsettled' থেকে গেল। স্বদেশি বা বয়কট নিয়ে বিতর্ক থাকলেও, এর মূল উদ্দেশ্য ব্রিটিশ শক্তিকে বঙ্গ-বিভাজন থেকে প্রতিহত করা, তা শেষপর্যন্ত সফল হয়েছে। বঙ্গভঙ্গের পরবর্তী তিন বছরে চরমপন্থী ও সন্ত্রাসবাদী সক্রিয়তায় ব্রিটিশ নিপীড়ন যেমন বেড়েছে, তেমনি বিপ্লবী কার্যকলাপও আরও বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে। এই পর্বেই মর্লে-মিন্টো সংস্কারের (Morley-Minto Reforms) সূত্রে সরকারের পক্ষ থেকে রাজনৈতিক সুবিধা দেবার ব্যবস্থা হল। ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে ভাইসরয় লর্ড হার্ডিঞ্জ সরকারকে বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাব প্রত্যাহারের অনুমোদন দিলেন। বাংলাকে আত্ম-নিয়ন্ত্রণের কিছু অধিকার দেওয়া হলেও, ভারতের রাজধানী বাংলা থেকে দিল্লিতে স্থানান্তরিত হল। বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে আন্দোলন যে বিফলে যায়নি, বঙ্গবিভাজন থেকে শেষপর্যন্ত ব্রিটিশ শক্তির অপসরণ সে কথা প্রমাণ করে। কোনো কোনো মহলে বলা হয়, চরমপন্থী ও বৈপ্লবিক আন্দোলনের চাপই ব্রিটিশ সরকারকে আপোস রফার নীতি গ্রহণে বাধ্য করেছে।

চতুর্থত, আত্মত্যাগ, নিষ্ঠা, দেশের প্রতি ভক্তির যে প্রকাশ স্বদেশি আন্দোলনের সূত্রে দেখা গেছে তাকে কোনোভাবেই ভোলা যায় না। ক্ষুদিরাম, প্রফুল্ল চাকির আত্মত্যাগ, ছাত্র ও যুবকদের উৎসাহ ও উদ্দীপনা, মহিলাদের অরন্ধন, রাখি উৎসবের বন্ধন, বন্দেমাতরম্ ধ্বনির সমবেত উচ্চারণ—প্রতিটি বিষয়ের আবেদন অত্যন্ত স্পষ্ট। একটি নতুন যুগের আবির্ভাব লগ্নকে চিহ্নিত করেছে এই আন্দোলন। ব্রিটিশ শাসককে 'বন্দেমাতরম্' উচ্চারণের বিরুদ্ধে আদেশ জারি করতে হয়েছে এবং এর প্রতিক্রিয়াও হয়েছে সমানে সমানে। কার্জন, ফুলার-এর প্রশাসনিক নীতি ও নিপীড়নের জবাব মিলেছে মাঠে, ঘাটে, সভা-সমিতি স্বদেশির নানা মঞ্চে ও মিছিলে।

সবশেষে বলা চলে, স্বদেশি আন্দোলন ভবিষ্যৎ জাতীয় আন্দোলনের প্রস্তুতি পর্ব বা ভিত্তি স্থাপনের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ভূমিকা পালন করেছে। একটি সংগঠিত মঞ্চ থেকে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের প্রথম প্রকাশ হিসাবে একে দেখা চলে। আন্দোলনের কৌশল নিয়ে বিতর্ক থাকলেও ভবিষ্যতের জাতীয় আন্দোলনের গতি অনেকটাই নির্ধারিত হয়েছে এই আন্দোলনকে সামনে রেখে। গান্ধিজি, মালব্য, নেহরু, প্যাটেল, সুভাষচন্দ্র—জাতীয় আন্দোলনের নানা ধারার নেতৃত্ব স্বদেশি আন্দোলনের শিক্ষায় পুষ্ট হয়েছে। স্বদেশি আন্দোলনের ঐতিহাসিকতা প্রমাণ পেয়েছে স্বাধীনতার পরবর্তীকালে এবং এর শতবর্ষ পেরিয়ে যাবার পরেও, আন্দোলন নিয়ে ব্যাপক চর্চা ও গবেষণার নিরিখে।

সমালোচনা : বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনের ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক, সামাজিক-সাংস্কৃতিক ভূমিকাকে উপেক্ষা না করেও বলা চলে স্বদেশি ও স্বরাজ অর্জনের ক্ষেত্রে এই আন্দোলন তেমন সাফল্য অর্জন করতে পারেনি। সমালোচকরা মনে করেন :

(১) স্বদেশি ও বয়কটের আন্দোলন ভারতীয়দের কাছে নতুন ছিল না। ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দের আগেই ভারতের আর্থিক স্বার্থ সংরক্ষণের দাবি জাতীয়তাবাদী মহলে উঠেছিল। বাংলায় নবগোপাল মিত্র এবং রাজনারায়ণ বসু যে হিন্দু মেলার আয়োজন করেছিলেন তাতে স্বদেশি দ্রব্য গ্রহণ ও বিদেশি দ্রব্য বর্জনের আহ্বান ছিল। মহারাষ্ট্রে লোকহিতবাদী (Lokahitabadi) সংগঠন '*প্রভাকর*' সংবাদপত্রের মাধ্যমে স্বদেশির বার্তা পৌঁছে দেয়। পশ্চিম ভারতে নৌরোজি, রানাডে, ডি. ভি. জোশি, তিলক স্বদেশির বাণী প্রচারে এনেছেন। মালব্য, মুরলীধর উত্তর ভারতে স্বদেশির পক্ষে বলেন। সমগ্র ১৮৭০ থেকে ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দ সময়কালে '*পুনা সার্বজনিক সভা*' স্বদেশি দ্রব্য সম্পর্কে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বঙ্গভঙ্গের বহু আগে ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে ভারতীয় শিল্পকে সংরক্ষণের দাবিতে ব্রিটিশ শিল্প ও বাণিজ্য নীতির বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষিত হয়েছিল। ম্যাঞ্চেস্টারে প্রস্তুত কাপড়ের বিরুদ্ধে বয়কটের দাবি ১৮৭৫-৭৮ খ্রিস্টাব্দের সময় থেকেই উঠেছিল। ইলবার্ট বিলের বিরুদ্ধে ইংরেজদের প্রতিবাদের প্রতিক্রিয়া হয়েছে সমানতালে। স্বদেশির ডাক তিলক বহুপূর্বেই দিয়েছিলেন। কংগ্রেসের মঞ্চ থেকে সুরেন্দ্রনাথ ১৯০২ খ্রিস্টাব্দে ভারতীয় শিল্প সংরক্ষণের তাগিদে স্বদেশির কথা বলেন।

(২) স্বদেশি আন্দোলনের বিরুদ্ধে ব্রিটিশ সরকার যে পীড়নের নীতি গ্রহণ করে তা আন্দোলনের গতিকে যথেষ্ট ব্যাহত করে। আন্দোলনের উৎসাহ-উদ্দীপনা নির্বাপিত হয়েছে সরকারের তিনটি নিষেধাজ্ঞাকে কেন্দ্র করে। জনসমাবেশ, 'বন্দেমাতরম্' মন্ত্র উচ্চারণ ও সংবাদপত্রের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে আন্দোলনকে স্তব্ধ করার কৌশল নিয়েছে সরকার। আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতিশীল মানুষের উপরও আতঙ্ক ছড়ানো হয়েছে নানাভাবে। সমাজের এক শ্রেণির মানুষকে বাধ্য করা হয়েছে আন্দোলনের পথ থেকে সরে আসতে, আন্দোলনকে পথভ্রষ্ট করতে।

(৩) স্বদেশি আন্দোলনের সবচেয়ে কঠিন বাধা ছিল ব্রিটিশ সাম্প্রদায়িক বিভাজন নীতি। কার্জনের উদ্দেশ্য ছিল বঙ্গ বিভাজনের মধ্য দিয়ে হিন্দু-মুসলিম বিভেদ সঞ্চারিত করা। কার্জন বঙ্গভঙ্গকে সফল করতে মুসলিম সম্প্রদায়কে সবরকম সুবিধা ও সমর্থন দিতে রাজি ছিলেন। নবাব সলিমুল্লাকে ও মুসলিম লীগকে (১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত) তিনি সরকারের সমর্থনে কাজে লাগাতে সমর্থ হয়েছেন। পূর্ববঙ্গে কার্জনের ভ্রমণ ও মুসলিম চেতনাকে প্ররোচনা জোগানো স্বদেশি আন্দোলনের মূলে আঘাত করেছে সন্দেহ নেই। কার্জন চেয়েছেন পূর্ববঙ্গের মুসলিম জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করে, বাংলার ঐক্যকে ধ্বংস করতে। তাঁর পূর্ববঙ্গ সফর ও ঢাকা বক্তৃতার লক্ষ্যই ছিল ঐক্যবদ্ধ বাংলার শক্তিকে বিক্ষিপ্ত, বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া। বঙ্গভঙ্গ কার্যত বাংলাভাষীদের বিচ্ছিন্ন করার এক সচেতন পরিকল্পনা।